প্রবন্ধের শিরোনামঃ বেদান্ত দর্শনঃ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক

আশিক বিশ্বাস*

বেদান্ত দর্শনঃ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক

সারসংক্ষেপঃ *ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলোকে আস্তিক ও নাস্তিক -এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত-এ ছয়টি দর্শন সম্প্রদায়কে আস্তিক, আর চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন- এ তিনটি দর্শন সম্প্রদায়কে নাস্তিক বলা হয়। অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন হলো আস্তিক ষড়দর্শনের অন্তর্গত দর্শন। মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন যা ব্রহ্মসূত্র নামে পরিচিত। ব্রহ্মসূত্রগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত। এগুলোর অর্থ সহজবোধ্য নয়। তাই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্রহ্মসূত্রের যেসব ভাষ্য রচিত হয়েছিল তার অধিকাংশই এর তাত্ত্বিক দিকের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু কোন দর্শন শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা, এর প্রায়োগিক দিক থাকা বাঞ্ছনীয়। বেদান্ত দর্শনের এ প্রায়োগিক দিকের সন্ধান পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তে। এ প্রবন্ধে পর্যায়ক্রমে বেদান্ত দর্শনের তাত্ত্বিক দিক (তাত্ত্বিকভাষ্য) ও প্রায়োগিক দিক (ব্যবহারিক বেদান্ত) ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দঃ বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত দর্শন, শংকর, ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্যবহারিক বেদান্ত।

ভূমিকাঃ সাধারণ অর্থে, বেদান্ত মানে বেদের সমাপ্তি। তবে এটি একমাত্র অর্থ নয়। বেদের অন্য অর্থ জ্ঞান। অতএব, বেদান্তের আক্ষরিক অর্থ জ্ঞান বা জ্ঞানের সমাপ্তি। জ্ঞানের শেষ কী? শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সমাপ্তি হচ্ছে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সূচনা, যা মন এবং ইন্দ্রিয়ের বাইরে। এটি আত্মা বা ব্রহ্ম বা উভয়ের জ্ঞান, যা মোক্ষ বা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। হিন্দু ধর্মে মুক্তি মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। বেদ মুক্তি অর্জনের জন্য সঠিক জ্ঞান এবং পদ্ধতি প্রদান করে এটিকে সহজতর করে।

বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে গৌরপাদ ও শঙ্করের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, মাধবাচার্যের দ্বৈতবাদ, শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য অসংখ্য আধ্যাত্মিক গুরু এবং ধর্মনিরপেক্ষ পণ্ডিতদের লেখা ও রচনা দ্বারা বেদান্ত দর্শন জনপ্রিয় হয়েছে। এটি বর্তমানে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত সম্প্রদায়। অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন সাংখ্য, এবং বৈশেশিক একাডেমিক উদ্দেশ্যে পড়াশোনা করা হয় এবং তাদের সক্রিয় অনুসারী নেই, যেখানে বেদান্ত দর্শন তাঁর ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের কারণে ব্যাপক অনুসারীদের আকর্ষণ করে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য থেকেও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

উদ্দেশ্যঃ বেদান্ত দর্শন যে শুধুমাত্র তত্ত্বকেন্দ্রীক নয়, এর একটি প্রায়োগিক দিকও বিদ্যমান তা উপস্থাপন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতিঃ আলোচ্য প্রবন্ধটিতে চিরায়ত গুণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বেদান্ত দর্শন বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক এর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

---

* প্রভাষক (দর্শন), এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণার যৌক্তিকতাঃ কোন বিষয় যদি শুধু তত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তা একসময় অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। বাস্তব জীবনে তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমেই তত্ত্বের যথার্থ মূল্যায়ন হয়। বেদান্ত দর্শন দীর্ঘসময় ধরে শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর প্রায়োগিক দিকের আলোচনাও প্রয়োজন। তাই বেদান্ত দর্শনের প্রায়োগিক দিকটি তুলে ধরার নিমিত্বে আলোচ্য বিষয়টি গবেষণার দাবি রাখে।

সাহিত্য পর্যালোচনাঃ উপনিষদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় বেদান্ত। উপনিষদে যেসব দার্শনিক আলোচনা আছে সেগুলোর মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য লক্ষ্য করা গেলেও অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। আর উপনিষদের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। বেদান্ত দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম। বেদান্ত দর্শনকে অনেক সময় ব্রহ্মসূত্র নামে অভিহিত করা হয়। উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র-এ তিনটি বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ। মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে মোট ৫৫৫টি সূত্র আছে। ব্রহ্মসূত্রগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত। এগুলোর অর্থ সহজবোধ্য নয়। তাই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা দেন। এর ফলে নানা সম্প্রদায় ও নানা মত গড়ে ওঠে। বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে গৌরপাদ ও শঙ্করের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, মাধবাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ মতবাদগুলোর মধ্যে বেদান্ত দর্শনের তাত্ত্বিক দিকটি নিহিত। অপরদিকে এসব তাত্ত্বিক মতবাদের প্রায়োগিক দিকটি আমরা দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তে।

বেদান্ত দর্শনঃ বেদ ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যাগ্যবক্ষের মতে, প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যায়না সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান যে শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায় তাকে বেদ বলে। বেদ বিশেষজ্ঞ সায়ণাচার্যের মতে, যে গ্রন্থ পাঠে আমরা ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি তাই বেদ। কেউ কেউ আবার বেদ বলতে বোঝেন এমন শাশ্বত সত্যকে, যা ঋষিদের অন্তরে পরমপুরুষ ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে। এরা বেদকে নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলে মনে করেন। বেদের ব্যুৎপত্তিগত দিকের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সংস্কৃত 'বিদ' শব্দ থেকে বেদ শব্দটির উৎপত্তি। বিদ শব্দের অর্থ জানা তথা জ্ঞান বা বিদ্যা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন নামক ষড়েন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করতে পারিনা। বেদ হচ্ছে এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভের ধারক ও বাহক। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সবকিছুই এর প্রতিপাদ্য। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব নামে এই চারভাগে বেদের শ্রেণিবিন্যাস করেন। প্রতিটি বেদ আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এ চারভাগে বিভক্ত।

আমরা দেখতে পাই উপনিষদ হচ্ছে বেদের সর্বশেষ পর্যায়। উ+নি+সদ থেকে উপনিষদ কথাটির উৎপত্তি। 'উপ' দ্বারা সমীপবর্তীতা বোঝাই আর 'সদ' ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি বা বিনাশ। এ দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতীচ্যের চিন্তাবিদরা উপনিষদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, অরণ্যে আচার্যের কাছে উপবিষ্ট হয়ে বসে একমনে শিষ্য যে বিদ্যা লাভ করে তাই উপনিষদ। বিখ্যাত বেদান্ত ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য উপনিষদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, যা অবিদ্যা নাশ করে তাই উপনিষদ।

উপনিষদ ভারতীয় মনীষীদের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির মূল সূতিকাগার হিসেবে উপনিষদ সর্বজন নমস্য। সংক্ষেপে উপনিষদকে বেদান্ত নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের সর্বশেষে অবস্থিত বলেই এ নামে তাকে অভিহিত করা হয়। উপনিষদের উপর

নির্ভরশীল দর্শনকে বেদান্ত দর্শন বা শুধু বেদান্ত বলা হয়।

বেদের চারটি অংশ, যথা, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা অংশে বেদের মন্ত্রগুলো সংকলিত হয়েছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে যাগযজ্ঞের বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আরণ্যক অংশে যজ্ঞ সম্পর্কে ব্যাপক কল্পনা ও প্রতীক উপাসনার আদেশ আছে। আর উপনিষদে দার্শনিক আলোচনা বা ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আছে। বেদের সর্বশেষ অংশ উপনিষদ বলে একে বেদান্ত বলা হয়। আবার বৈদিকশাস্ত্র পাঠের ক্রমবিচার করলে প্রথমে পাঠ করতে হয় বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা, তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর আরণ্যক এবং সর্বশেষ পাঠ করতে হয় উপনিষদ। সুতরাং পাঠক্রম অনুসারে উপনিষদের স্থান সর্বশেষে। তাছাড়া বৈদিক চিন্তার সর্বোচ্চ এবং পূর্ণ বিকাশ ঘটে উপনিষদে। এজন্য উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়।

ব্রহ্ম বেদান্ত দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এটা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র হতে প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র হল 'অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা' অর্থাৎ এখন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা আরম্ভ এবং দ্বিতীয় সূত্র হল 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যা হতে এ বিশ্ব এসেছে, এবং যাতে এই বিশ্বের স্থিতি ও লয়, তিনিই ব্রহ্ম। বেদান্ত দর্শন অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রচার করে। বাদরায়ণের মতে, সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মায় ব্রহ্ম। তাঁর মতে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

বেদান্ত দর্শনের তাত্ত্বিক দিক

গৌড়পাদের অজাতিবাদঃ গৌড়পাদই অদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবক্তা। অজাতি অর্থ যার কোন প্রকার জাত বা ভেদ নাই। তিনি মাণ্ডুক্য, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ হতে অদ্বৈতবাদী ভাবধারা আহরণ করেন। গৌড়পাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের সাথে অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করেন। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার অনুসারে জড়জগৎ বা বাহ্যবস্তু মিথ্যা কিন্তু মন সত্য। অন্যদিকে বৌদ্ধ মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ অনুসারে জড়জগৎ ও মনোজগৎ উভয়ই মিথ্যা বা শূন্য। বৈদিক ও বৌদ্ধ দর্শনের ঐতিহ্যের মধ্যে ক্রমান্নোতির যে সংশ্লেষণ চলে তার পরিণতিতে গৌড়পাদের বেদান্ত দর্শনের আত্ম প্রকাশ ঘটে (ঘোষ, ২০১৯: ৪০৭)।

অজাতিবাদ গৌড়পাদের দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্ব। এ তত্ত্বের ওপর বৈদিক ও বৌদ্ধ দর্শনের তুলনামূলক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় (ঘোষ, ২০১৯: ৪১১)। অজাতিবাদই গৌড়পাদের অদ্বৈতবাদ। এ তত্ত্বের সাহায্যে তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব, সৎকার্যবাদ ও দ্বৈতবাদ খন্ডনকরেন। তাঁর মতে, মূলতত্ত্ব এক ও অদ্বৈত। এটি এমন একটি পরম তত্ত্ব যা স্বয়ম্ভু এবং যা হতে কোন কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব খন্ডন প্রসঙ্গে গৌড়পাদ বলেন, এ জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি। তাঁর ইচ্ছা, ভোগ, ক্রীড়া কিংবা মায়ার জন্য জগৎ সৃষ্টি নয়। এ জগৎ কোন প্রাণতত্ত্ব এবং কালতত্ত্বের সৃষ্টিও নয়। ব্রহ্ম এ জগতের কারণ এবং মূল কারণের অভিব্যক্তি হল এ জগৎ। গৌড়পাদের মতে, ব্রহ্মের ভোগার্থে বা ক্রীড়ার্থে এ জগৎ সৃষ্টি এ সম্পর্কিত সৃষ্টিতত্ত্ব সঠিক নয়।

ব্রহ্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। তাঁর কোন ইচ্ছা নাই, ভোগ স্পৃহাও নাই। তিনি শুধু সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি তাঁর স্বভাব। সৃষ্টি তাঁর সত্তা হতে উৎসারিত হয়। এরূপ একটি উৎসারণ তত্ত্বে (Emanation) গৌড়পাদ বিশ্বাস করতেন। গৌড়পাদের মতে, অদ্বৈত ব্রহ্ম শুদ্ধ আত্মা। ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই, কোন বিভিন্নতা নেই। তাঁর পরিপূর্ণ সত্তা হতে জগতের সৃষ্টি। জগৎ, জগতের সমুদয় বস্তু এবং অসংখ্য খণ্ড আত্মা সবই ব্যবহারিক বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হয়। এরূপ জ্ঞান অবিদ্যাপ্রসূত এবং এর মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি আছে।

অখণ্ড অদ্বৈত আত্মা মায়ায় আবৃত থাকে। তাই এদের সত্য জ্ঞান হয় না। দ্বৈত জড়ানমায়ারসৃষ্টি। জগৎ, এবং সসীম খণ্ড আত্মা পরম ব্রহ্মহতেসত্তাবাননয়। ব্রহ্মা ও আত্মারমধ্যে দ্বৈতজ্ঞানসত্য নয়। গৌড়পাদ বলেন, মূলতত্ত্ব অজ, এর কোন কারণ নেই, জন্মও নেই। এর কোন পরিবর্তন নেই। এ নিত্য ও শাশ্বত। মূল তত্ত্ব নিত্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই, যুক্তির আকাঙ্ক্ষাও নেই। গৌড়পাদ এ তত্ত্বটির নাম দিয়েছেন অজাতিবাদ (ঘোষ, ২০১৯: ৪১৩)।

শংকরাচার্যের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদঃ ব্রহ্মসূত্রের ওপর শংকর তাঁর বিখ্যাত *শারীরক ভাষ্য* রচনা করেন। এ গ্রন্থেই তিনি তাঁর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মধুক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য এই দশটি উপনিষদের ওপর ভাষ্য রচনা করেন। গীতার ওপরও তিনি ভাষ্য রচনা করেন। শংকরের মতে, ব্রহ্মার স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত বেদ নাই।

শংকরের অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল, ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নির্বিশেষ চৈতন্য স্বরূপ। ব্রহ্মের কোন ভেদ নেই। শংকরের মতে, জ্ঞান দুই প্রকার- পারমার্থিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান। পারমার্থিক অর্থে ব্রহ্মই সত্য। জীব ও জগতের ব্যবহারিক সত্যতা আছে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এগুলোর যথার্থ সত্তা নেই। মায়া শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম জগৎ রূপে প্রকাশিত হন। মায়ার জন্যই এদের সত্য মনে হয়। তত্ত্ব দৃষ্টিতে মায়ার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মায়ার সৎ ও অসৎ রূপের কথা বলা হয়ে থাকে। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের বিবর্ত। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। অবিদ্যা বন্ধনের কারণ। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জানলেই বন্ধন মুক্ত হওয়া যায়। শংকর জ্ঞান যোগী। তাঁর পদ্ধতি জ্ঞানের, ভক্তির নয়। শংকরের পরবর্তীকালে, বৈষ্ণব দর্শনে জ্ঞান মিশ্রিত প্রেম ও ভক্তির পথ স্বীকৃত হয়েছে। শংকর ছিলেন গৌড়পাদের উত্তর সাধক। শংকর মনে করেন, অদ্বৈতবাদ উপনিষদ ও বেদান্ত সূত্রের মূল কথা।

রামানুজের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদঃ রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক। তাঁর মতে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই পরম সত্তা। রামানুজের মতে বহ্মার স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ নাই কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। ব্রহ্মের দুটি অংশ যথা– চিৎ (জীব) ও অচিৎ (প্রকৃতি)। ব্রহ্মের অচিৎ অংশ হতে জড় বস্তু এবং চিৎ অংশ হতে চেতন জীবের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি চিৎ ও অচিৎ এর স্বাধীনসত্তা স্বীকার করেননি। ব্রহ্মের শরীর রূপেই চিৎ এবং অচিৎ এর সত্তা আছে। চিৎ এবং অচিৎ অংশ নিয়েই ব্রহ্ম এক পরম ঐক্য। এই ঐক্যের বাইরে অন্য কোন কিছুর সত্তা নেই। এজন্য রামানুজের মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়। তবে এই অদ্বৈতবাদ নির্বিশেষ নয়, বিশেষ। কেননা রামানুজ বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, পরমাত্মা অনন্ত জগৎ ও জীবসমূহের বিভিন্ন আকারে নিজেকে বিভক্ত করে তাদের আত্মারূপে বর্তমান থাকেন। এ কারণেই রামানুজের অদ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চরম অদ্বয় ও ঈশ্বরবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা। ঈশ্বরবাদ স্বগুণ ব্রহ্মের কথা বলে অন্যদিকে চরম অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মের গুণ স্বীকার করে না।

রামানুজের পূর্ব থেকেই বৈষ্ণব ধর্মকে বেদান্ত ভিত্তিক করার প্রচেষ্টা চলছিল। শংকর বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন সত্তা স্বীকার করেননি। পরিদৃশ্যমান জগৎকে অলীক বা মিথ্যা বলেছেন। এ তত্ত্বের ওপর ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। শংকরের মতবাদ অদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু বেদান্তের দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাও আছে যা অনুযায়ী ব্রহ্ম ও জীব বা বস্তু জগতের মধ্যে চিরন্তন বৈলক্ষণ্য ও ভেদ বর্তমান (ভট্টাচার্য, ২০০০: ১৮৭)।

রাজানুজের মতবাদ এই উভয় মতবাদের মাঝামাঝি এবং এ কারণেই তাঁর মতবাদের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এ মতবাদে চরম অদ্বয়বাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলার কারণ হলো জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ স্বরূপ।

মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদঃ মধ্বাচার্য বিশ্বাস করতেন, ভেদই সত্য। পাঁচ প্রকার ভেদ অনাদি এবং সত্য। এই পাঁচ প্রকার ভেদ হল ঃ (১) চেতন-আত্মা বা জীবাত্মার সাথে ঈশ্বরের ভেদ (জীবেশ্বর ভেদ); (২) জড়ের সাথে ঈশ্বরের ভেদ (জড়েশ্বর ভেদ); (৩) জীবাত্মার সাথে জীবাত্মার ভেদ; (৪) জড়ের সাথে জীবাত্মার ভেদ (জড়জীব ভেদ) এবং (৫) জড়ের সাথে জড়ের ভেদ (জড়ভেদ)। এই পঞ্চবিধ ভেদই মৌলিক। এ জগৎকে তিনি ভেদ প্রপঞ্চ বলে অভিহিত করেন। চেতন-আত্মা বা বিষয়ী এবং জড় বস্তু নিয়ে এ জগৎ। জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ীর সাথে যেমন প্রত্যেকটি বিষয়ীর পার্থক্য আছে, তেমনি প্রত্যেকটি বিষয়ীর সাথে জড়ের এবং জড়ের সাথে জড়ের পার্থক্য আছে। এ ছাড়াও ঈশ্বরের সাথে জীব এবং জড়ের পার্থক্য আছে। কারণ কার্যরূপে পরিণত হলে একটি হতে অন্যটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশ হতে অন্য অংশ পৃথক হয়। মাধ্বের মতে, জড় জগৎ নিত্য ও সত্য।

মধ্বাচার্য ১০টি মৌলিক পদার্থের কথা স্বীকার করেন। এ পদার্থগুলো হল ঃ (১) ভাববস্তু বা দ্রব্য; (২) গুণ; (৩) ক্রিয়া; (৪) জাতি; (৫) বিশেষত্ব; (৬) বিশিষ্ট; (৭) অংশী; (৮) মেথাশক্তি; (৯) সাদৃশ্য ও (১০) অভাব। মধ্বাচার্যের মতে, এ দশটি পদার্থ সর্ব প্রকার ভিন্নতার ভেদক।

মধ্বচার্যের মতে, এ জগতের স্বাধীনসত্তা আছে। এ জগৎ কার্য কারণ সাপেক্ষ জগৎ। এটি যেমন সগুণ ব্রহ্মের কার্য, তেমনি এতে প্রত্যেকটি সত্তার সঙ্গে প্রত্যেকটি সত্তার কার্য কারণ সম্পর্ক রয়েছে। এ জগৎ মিথ্যা হতে পারেনা। মধ্বের মতে ব্রহ্ম বা বিষ্ণু নিত্য ও অপরিহার্য। ব্রহ্মাই সব কিছুর কারণ। এভাবে দেখলেই তিনি বধোগম্য হন। চেতন আত্মা অথবা বিষয়সমূহ এবং বস্তুসমূহ নিয়ে জগৎ গঠিত হয়। ব্রহ্মেরই একমাত্র শক্তি আছে। এ জন্যই তিনি স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু পূর্ণ, নির্দোষ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয় (ভট্টাচার্য, ২০০০: ১৮৯)।

বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদঃ বল্লভাচার্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেছিলেন তা *অনুভাষ্য* নামে পরিচিত। বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁর মতে, জগৎ ও আত্মা ব্রহ্মের সাথে সম্পূর্ণ রূপে অদ্বৈত। কেননা কারণ- ব্রহ্ম এবং কার্য- ব্রহ্ম উভয়েই শুদ্ধ এবং পরস্পর অভিন্ন। পরাবিদ্যা প্রমতত্ত্ব এবং ধর্মের ঈশ্বর অভিন্ন। বেদান্তে যিনি ব্রহ্ম, স্মৃতিতে তিনি পরমাত্মা এবং ভগবতে তিনিই ভগবান (ঘোষ, ২০১৯: ৫৮৭)।ব্রহ্ম শুদ্ধ সৎ। চিৎশক্তি বা বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম জড়শক্তি বা প্রকৃতির ভেদ ব্রহ্মে থাকে না। এ জন্যই ব্রহ্মকে শুদ্ধাদ্বৈত বলা হয়ে থাকে।

বল্লভাচার্য ব্রহ্মের তিনটি রূপের কথা উল্লেখ করেছেন। এ তিনটি রূপ হল– পুরুষোত্তম, অন্তর্যামী এবং অক্ষর ব্রহ্ম। পুরুষোত্তম ব্রহ্মাই হলেন পরম ব্রহ্ম। তিনি পরমানন্দ স্বরূপ। তিনিই কৃষ্ণ, জীবের পরমাস্পদ। ব্রহ্মই অন্তর্যামীরূপে জীব ও জগতের অন্তরে বিরাজ করেন। 'ওঁ' এ বৈদিক মন্ত্র বীজ অক্ষর ব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপ।

ব্রহ্ম নিজের সত্তা হতে আনন্দ বশত এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগৎ ব্রহ্মের সৎ রূপ। পরম ব্রহ্মের ইচ্ছা থেকেই বিভিন্ন বস্তু এবং এদের গুণাবলি সৃষ্টি হয়েছে। বুদ্ধি মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এ মায়ার প্রভাব মুক্ত হতে পারলেই শুদ্ধাশুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ সম্ভব। বল্লভাচার্য বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য

করে থাকেন। জীবসাধনা, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মের দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ সাধন করতে পারে। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর অবিদ্যা নষ্ট হলে জীবের তৈরি প্রতিভাসের জগৎও নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদঃ শ্রীচৈতন্যের মতবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য ও রামানুজের দ্বারা প্রভাবিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এঁদের আচার্য বলে মনে করে। শ্রীচৈতন্য মধ্বার ভেদ সম্পর্কিত মত সমর্থন করেন। তিনি জগতের সাথে ঈশ্বরের অভিন্নতায় বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর তার অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা জীবন ও জগৎকে ধারণ করেন। প্রলয়ে জীব এবং জগৎ ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে লয় হয়ে যায়। এ মতবাদই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। ঈশ্বর, জীবসমূহ ও জড় জগতের মধ্যে সম্বন্ধ হচ্ছে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুসারীরা শংকরের মতের বিরোধিতা করেন। শ্রীচৈতন্য মনে করেন, শংকর ব্রহ্ম সূত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা দেননি। ব্রহ্মনির্বিশেষ নয়। জগৎ ও জীবন সত্য। শংকর ব্রহ্মের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে গৌণ অর্থ বা লক্ষণার্থের ওপর জোর দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের মত অনুসারে, ১. পরমতত্ত্ব হচ্ছে ব্রহ্মা যিনি জগতের প্রভু এবং সৃষ্ট জীবের সাথে তার প্রেম ও স্নেহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; ২. ঈশ্বর ও তাঁর শক্তিকে কৃষ্ণ ও রাধা বলে ধারণা করা হয় (ভট্টাচার্য, ২০০০: ১৯১)। শ্রীচৈতন্যের মতে, কৃষ্ণই পরম তত্ত্ব বা পরম ব্রহ্ম। তিনি তাঁর শক্তি মায়া শক্তিরূপে বিশ্ব জগৎ আচ্ছাদন করে রেখেছেন। যে শক্তি বলে তিনি বহু শক্তিরূপে প্রতিভাত হন তার নাম বিলাস শক্তি। বিলাস শক্তি আবার দুই রকম, যথা-প্রভাব বিলাস ও বৈভব বিলাস। প্রভাব বিলাসের বশে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা কালে তিনি এক কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণে পরিণত হন। আর বৈভব বিলাস বলে তিনি বাসুদেব (বুদ্ধি), সংকর্ষণ (চেতনা), প্রদ্যুম্ন (প্রেম) ও অনিরুদ্ধ (লীলা) এই চতুর্ব্যূহ রূপ পরিগ্রহ করেন। কৃষ্ণের প্রধান শক্তি প্রেম। শ্রীমতি রাধা তাঁর প্রেম ভাবে মূর্ত প্রতীক বা হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণ পরমাত্মা। তিনি অসীম ও পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ। চিৎশক্তি যুক্ত জীবাত্মা তাঁর আণবিক অংশ। অংশ ও অংশী রূপে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কিন্তু জীবাত্মার পৃথক সত্তার দরুন একটা ভেদের ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে।

বেদান্ত দর্শনের প্রায়োগিক দিক

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তঃ স্বামী বিবেকানন্দ দার্শনিকতায় ছিলেন সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ। অলৌকিক তার প্রত্যাশী তিনি আদৌ ছিলেন না। বাস্তব ও প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার আলোকে স্নাত হয়েছে তাঁর মনন ভূমি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রধান প্রধান সব কটি দার্শনিক ধারাকে মন্থন করে তিনি তার দার্শনিক সৌধ নির্মাণ করেন। এ সৌধের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিলো মানুষ। আর প্রাত্যক্ষিক ক্ষমতা তিনি লাভ করেছিলেন তার আদর্শ গুরুঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছ থেকে। এই প্রত্যক্ষ করার প্রথম সুযোগে পেলেন দক্ষিণেশ্বরে। হৃদয়ে অনুভূতি জাগল ঠিকই, কিন্তু সংশয়ী মন বা তার মনীষা তখনও এই অনুভবের পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পেলনা। অনেক পরে ধীরে ধীরে বেদান্তের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে এই অনুভূতির পেছনে যে অভ্রান্ত যুক্তি রয়েছে, তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং সারাজীবন ধরে সমস্ত জগদ্বাসীকে এই বেদান্তের অভ্রভেদী বাণী মেঘ মন্ত্রস্বরে শোনিয়ে শোনিয়ে সকলের মধ্যে সেই অনুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়াসেই আত্মনিয়োগ করলেন।

বিবেকানন্দের দর্শন তাই যেমন প্রত্যক্ষভিত্তিক বা অনুভবমূলক, তেমনি তা বেদান্তভিত্তিক বা যুক্তিমূলক। বিবেকানন্দ দেখলেন এই একটি মানুষের (শ্রীরামকৃষ্ণ) মধ্যে সমস্ত ভেদ-বিভেদ এক পরম ঐক্যে এসে মিলিত ও মূর্ত হয়েছে। তাঁর কাছে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সমাজে পতিত ও উন্নত সবাই সমান

সমাদরে গৃহীত, একেরই প্রকাশ রূপে আদৃত। জগতে সব কিছুই যেন ভিন্ন ভিন্ন, নানা এবং এই ভেদের দৃষ্টিই সমস্ত অনর্থের মূল। এই মানুষটি যেন সব ভেদের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে পরম আনন্দে আছেন এবং তাকেও সেই আনন্দের সাক্ষাৎ আস্বাদন তিনি এনে দিয়েছেন। আস্বাদন বা অনুভব তিনি পেলেন, কিন্তু এর পেছনে যুক্তি কী? মানুষকে কেমন করে বুঝানো যাবে যে, এই ভেদবোধ একান্ত মিথ্যা, আসলে আমরা সবাই এক। এই যুক্তির অন্বেষাই বিবেকানন্দকে বেদান্তের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করল (লোকেশ্বরানন্দ, ১৩৯৭: ২০২-২০৩)। ভেদবোধকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য বিবেকানন্দ তাঁর অনন্য সাধারণ মেধায় বেদান্তকে নবরূপে রূপায়িত করলেন, যার নাম তিনি নিজে দিয়েছেন ব্যবহারিক বেদান্ত, প্রায়োগিক বেদান্ত বা কার্যে পরিণত বেদান্ত।

বেদান্তের মধ্যেই বিবেকানন্দ তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের সন্ধান পেলেন। মূলত শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তকেই তিনি ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। তবে তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব দান, নিজস্ব ব্যাখ্যা যথেষ্ট রয়েছে। ফলকথা, শংকরাচার্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তকেই তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করে এর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন। এটা সম্ভব হয়েছিলো কেবল বিবেকানন্দের মতো একজন স্থিত প্রাজ্ঞ পুরুষের অনন্য সাধারণ প্রতিভা বলে।

আপাত দৃষ্টিতে যে অদ্বৈত বেদান্তকে তাত্ত্বিকভাবে দেখা বা ভাবা হয়ে থাকে, যে দর্শনে ব্রহ্ম ও আত্মা ভিন্ন আর কোন কিছুকেই সত্তার মর্যাদা দেওয়া হয়নি, সেই দর্শনকে বিবেকানন্দ তাঁর ক্ষুরধার মননের দ্বারা ব্যবহারিক কর্মময় জীবনে ফলপ্রসূ করে তুলেছিলেন। এই বেদান্তের মধ্যেই তিনি লাভ করেছিলেন সমদর্শিতার জ্ঞান, যাবতীয় বিভেদ রহিত অখণ্ড সত্তার জ্ঞান। তিনি বিলক্ষণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই দর্শনকে যদি বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো যায় তাহলে যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বেদান্তকে ব্যবহারিক দর্শনে পরিণত সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন বেদে রূপায়িত করেছিলেন। আর এ কারণেই তিনি এর নাম রাখেন ব্যবহারিক বেদান্ত বা ফলিত বেদান্ত।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, বিবেকানন্দ প্রয়োগাত্মক বা প্রযত্নসাধ্য এই দুই অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে 'ব্যবহারিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি গিরিগুহা ও অরণ্যস্থিত বেদান্তকে লোকসমাজে টেনে এনে সমাজের সর্বস্তরে, আমাদের হাসি-কান্নার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র বৈদান্তিক ব্রহ্মচিন্তার মাধ্যমেই সমাজ ও সর্বস্তরের মানুষের প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব। এ কথায় তাঁর অগাধ আস্থা ছিল বলেই তিনি দেশের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে অদ্বৈতবাদের প্রচারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ কারণেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, অতএব, বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর (Practical) হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যকর করিতে হইবে (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২১৯)। এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে তিনি এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বেদান্ত শুধু তত্ত্ব বা দার্শনিক সিদ্ধান্ত রূপে না দেখে দৈনন্দিন জীবনের পালনীয় ধর্মে পরিণত করতে হবে। তাই একে ব্যবহারিক রূপ দিতে হবে। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতদের কেউ কেউ আবার বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত বা কার্যকর বেদান্তকে দুর্বোধ্য বলে অভিহিত করেছেন। তাদের কাছে ব্যবহারিক বেদান্তের সরল বক্তব্য বিষয় অস্পষ্ট। তাদের উদ্দেশ্যেই বিবেকানন্দ ব্যবহারিক বা কার্যকর বেদান্ত বলতে আসলে তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ব্যাখ্যাটি এরকম,

> এই রূপে নানাবিধ দিক হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবন-গঠন ও জীবন-যাপন করা অবশ্যই সম্ভব। আর যখন আমরা

> পরবর্তীকালের ভগবদ্‌গীতা আলোচনা করি, যাহা বেদান্ত দর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য, তখন দেখিতে পাই যে,আশ্চর্যের বিষয় যে যুদ্ধক্ষেত্র এই উপদেশের স্থান বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে– তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার চিরশান্ত ভাব। এই তত্ত্বকে কর্ম রহস্য বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২২০)।

> সমাজসহ মানুষের দৈনন্দিন কর্মজীবনে যে বেদান্তের প্রয়াজেনীয়তা রয়েছে এবং তাতেও যে বেদান্তকে প্রয়োগ করা যায়, এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ লিখেছেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদান্ত দর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যান লব্ধ নয়, পরন্তু ইহার সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলো সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক সার্বভৌম রাজা অপেক্ষা অধিকতর কর্মব্যস্ত মানুষ আর কল্পনা করা যায় না, তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণিত অক্ষৌহিণী-পরিচালক অর্জুনের তুলনায় আমার কাজের তাড়না কিছুই নয়, তথাপি এই যুদ্ধ কোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা শুনিবার এবং উহাকার্যে পরিণত করিবার সময় পাইলেন; সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও আরামের জীবনে ইহা পারা উচিত (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২২৫)।

এ সকল উক্তির মাধ্যমে বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন যে, বেদান্তের শ্রেষ্ঠ উৎস উপনিষদ এবং তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উদ্ভবও অরণ্যে বা গিরিগুহায় হয়নি। এদের প্রয়োগ এবং সাধনাও কেবল অরণ্যবাসী বা গুহাবাসীদের জন্য নয়। সমাজের সর্বক্ষেত্রে বেদান্তের প্রয়োগ, বেদান্তের উপযোগীতা সম্ভব; শুধু সম্ভব নয়, প্রয়োগ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভক্তিতে যেমন সকল মানুষই অধিকারী, তেমনি আত্মতত্ত্বের চিন্তায়, ব্রহ্মাত্মা চিন্তায় সকল মানুষেরই অধিকার আছে। মুখ্য অধিকার না হোক, গৌণ অধিকার অবশ্যই আছে। কারণ সকলেই আত্মা, সকলেই ব্রহ্ম। এই স্থির সিদ্ধান্ত সত্যটি মানুষের নিকট গোপন রেখে কোনো লাভ হয়নি। বরং এই রহস্যটি সকলে জানলে কিছু উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মানুষের দৈনন্দিন কর্ম জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ সম্পর্কে তাই বিবেকানন্দ বলেন, আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলে। বেদান্ত দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে। কোন কিছুই ইহাকে বাধা দিতে পারে না, কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহাপূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছে, পূর্ব হইতেই লব্ধ রহিয়াছে।

বিবেকানন্দের উদ্ধৃতির আলোকে ব্যবহারিক বেদান্ত সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা বলা হলো তা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিবেকানন্দ চেয়েছেন বৈদান্তিক সিদ্ধান্তগুলোকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে। এ জন্য প্রথমেই প্রয়োজন আত্মার শুদ্ধতা ও মুক্ততা স্মরণ রেখে কর্মে অনাসক্ত ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত থেকে সম ও শান্ত ভাব রক্ষা করা। বিবেকানন্দের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো বেদান্তের আলোকে জীবন যাপন করে বেদান্তকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত করা। মনে রাখতে হবে বেদান্তকে কার্যে পরিণত করতে না পারলে তার কোনো মূল্য নেই।

ব্যবহারিক বেদান্ত সম্পর্কে বিবেকানন্দের উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্যবহারিক কথাটি একাধিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। অন্তত পৃথক চারটি অর্থে তিনি শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। ব্যবহারিক বেদান্ত কথাটির প্রথম অর্থ হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, কর্ম ও ব্যবহারিক জীবনে ব্রহ্মাত্ম চিন্তা আবশ্যক। এ অর্থে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মবহুল মুহূর্তে বেদান্তকে প্রয়োগ করতে হবে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরা যদিও মনে করে থাকেন যে, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল পাঠের অধিকারী তবু গৃহস্থাশ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিও বেদান্ত অনুশীলন করতে পারেন। এতে শাস্ত্রের কোন বাধা নেই। বিশুদ্ধ অদ্বৈত বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যও বেদান্ত অনুশীলনে গৃহস্থের গৌণাধিকার অস্বীকার করেননি। উপরন্তু যে পরিবেশে যে সকল ব্যক্তির মধ্যে ঔপনিষদীয় ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচেনা পরিলক্ষিত হয়, তাতে দেখা যায় আত্মচিন্তা, ব্রহ্মচিন্তা সর্বাবস্থায় সকল স্তরের মানুষই করতে পারে। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনেও বেদান্ত প্রয়োগের প্রয়াজেনীয়তা রয়েছে। বিবেকানন্দের মতে, বেদান্তকে যদি কর্মজীবনের সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়, তাহলে সর্বস্তস্তরের মানুষই আত্মচিন্তা বা ব্রহ্মাচিন্তার দ্বারা উপকৃত হবে। অবশ্য এই উপকৃতি বহুলাংশেই নির্ভর করে মানুষের মানসিক উদ্দেশ্য ও অবস্থাদির উপর। মানসিকভাবে যারা ব্রহ্মচিন্তায় বেশি অগ্রসর, তাঁরা উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হবেন, আর যারা অনগ্রসর তারা নিকৃষ্ট ফল লাভ করবেন। তাই বিবেকানন্দ বলেন, যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হবে। যদি তুমি মুক্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদকে প্রয়োগ করিতে হইবে- তাহা হইলে মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভালো হইয়াছিলো যে, এতদিন অদ্বৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিলো- অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে (বিবেকানন্দ, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৬৯: ৩৩৪)। অন্যত্র তিনি বলেছেন,

> তবু লোকের মন হইতে এখনও সংস্কার যায় নাই যে, উপনিষদে কেবল সন্ন্যাসীদের আরণ্যক জীবনের কথাই আছে। গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে কাজই কর-না-কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই সকল মহানতত্ত্ব কেবল অরণ্য বা গিরিগুহায় থাকিবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যায়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে। উপনিষদ নিহিত তত্ত্বাবলী জেলে-মালী প্রভৃতি জনসাধারণ কিভাবে কার্যে পরিণত করিবে? যে যতটুকু পারে করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভালো মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভালো বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন আইনজ্ঞ হইবে। এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র (বিবেকানন্দ, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৬৯: ১৩৭)।

তিনি আবার বলেছেন, আর এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে, কর্মজীবনেই ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্যবহারিক জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োগে (বিবেকানন্দ, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৬৯: ২৪০)। এটাই হচ্ছে গিরিগুহা ও অরণ্যের গহন থেকে বেদান্তকে সংসার ও সমাজ জীবনে বের করে আনা।

দ্বিতীয় অর্থে বিবেকানন্দ ব্যবহারিক বেদান্ত বলতে বেদান্তের সাধন মার্গকে যথাযথভাবে অনুশীলন করে কর্মজীবনে পরিণত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই অর্থের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী লিখেছেন,

> প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের দ্বিতীয় অর্থ এই যে, বেদান্ত বলিতে কেবলমাত্র তাহার চরম প্রতিপাদক অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্ম তত্ত্বই বুঝায় না। বেদান্তের যে সাধন-শম, ধর্ম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এবং অন্যান্য তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্য প্রভৃতি সেসবও বেদান্তের প্রতিপাদ্য— বেদান্ত দর্শনে 'সাধন অধ্যায়' নামে একটি অধ্যায়ই রহিয়াছে। সুতরাং অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্বে কর্মানুপ্রবেশ অসম্ভব হইলে ও বেদান্তের সাধনাংশ সম্পূর্ণ রূপেই অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, সম্পূর্ণ আত্মসাপেক্ষ, Practical। লক্ষণীয় যে, বিবেকানন্দ কর্মজীবনে বেদান্ত শীর্ষক ভাষণগুলোতে ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থতা, প্রেম প্রভৃতি এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি সাধনও আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং Practical বেদান্তের দ্বিতীয় অর্থ—বেদান্ত সাধনের অনুষ্ঠান ও অভ্যাস করিয়া এগুলোকে জীবনে পরিণত অর্থাৎ আয়ত্ত করা। তাই বিবেকানন্দ পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে, বেদান্তকে জীবনে পরিণত করিতে হইবে, নতুবা উহা বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। কেবল বুদ্ধিস্থিত মতবাদ চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর করাইতে পারিবে না (শাস্ত্রী, ১৯৯০: ১৪৫)।

তাই বেদান্তের সাধনপ্রণালীকে অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে তাদের প্রয়োগ করতে হবে।

তৃতীয় অর্থে বিবেকানন্দ চরমতত্ত্ব সম্বন্ধেই ব্যবহারিক বেদান্ত কথাটির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেন। এখানে 'কার্যকর' কথাটিকে গ্রহণ করা হয়েছে 'জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব' অর্থে। তাছাড়া অদ্বৈত বেদান্ত কখনও মানুষের পক্ষে যা আয়ত্ত করা অসম্ভব, এমন কোন তত্ত্ব বা আদর্শকে উপস্থাপিত করেন নি। সুতরাং উপর্যুক্ত সাধনার মাধ্যমে অতি সহজেই চরম তত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ লিখেছেন,

> শাস্ত্রনিষ্ঠা কথাটির অর্থ যেমন উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল করিয়া করা হয়, অর্থাৎ আমি যাহা বুঝি তাহাই শাস্ত্রীয়, আর তোমার মত অশাস্ত্রীয়া—কার্যকর কথাটির অর্থও ঐরূপ করা হইয়া থাকে। আমি মহাকাজে লাগাইবার মতো বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্যকর। তোমরা দেখিতেছ, আমরা সকলে কেমন যাহা পছন্দ করি ও করিতে পারি, শুধু সেই বিষয়েই এই কার্যকরি শব্দটি প্রায়োগ করিয়া থাকি। এই হেতু আমি তোমাদিগকে বুঝিতে বলি যে যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে; উহা আদর্শ হিসাবে কার্যকর। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হোক-না-কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেনা, অথচ এই আদর্শই 'আদর্শ' নামের উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই সেই ব্রহ্ম'—ইহাই সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২২২)।

চতুর্থ অর্থে বিবেকানন্দ সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন বা ব্রহ্মদর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ, এ অর্থে ব্যবহারিক বেদান্ত কথাটির ব্যবহার করেছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, এটাই বোধ হয় সর্বোচ্চভাবের অভিনব অথচ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত অর্থ। একটি শুদ্ধ তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তই হচ্ছে অদ্বৈত বেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য বিষয়। যার পক্ষে 'তুমিই তিনি' এই অদ্বৈত তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে, তিনি অবশ্যই সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শনও লাভ

করেছেন। তিনি সর্বদা মানুষের হৃদয়ে বিশেষভাবে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে প্রেমপূর্বক সেবা করতে উন্মুখ হয়ে পড়েন। এটা সিদ্ধের লক্ষণ হলেও সাধকের পক্ষে তা উপায় মাত্র। আর এটাই তো বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।

গীতায় বলা হয়েছে, সংযতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ, দ্বিধাহীন ঋষিগণ সর্বভূতের কল্যাণে রত থেকে ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করে থাকেন। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যারা ইন্দ্রিয়াদিকে সম্যকভাবে সংযত করে সকল প্রাণীতে সমবুদ্ধি বিশিষ্ট হয়ে প্রাণীর কল্যাণেরত থাকেন তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ঋগ্বেদেও সকল মানুষের কল্যাণ ও সুখ কামনা করে বলা হয়েছে, মানুষ যেন সর্বপ্রকার অর্থের চেষ্টা করে, তারপর যেন সত্যের পথে পূণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেন সে নিজ কর্মের দ্বারা কল্যাণের ভাগী হয়, যেন মনে সে সুখ পায়। কেবল উপনিষদ, গীতা বা বেদই নয়, জ্ঞান ভক্তির শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে, সর্বভূতে অবস্থিত আত্মারূপ ঈশ্বরের সেবা না করে যারা শুধু বিগ্রহের পূজা করেন, তাঁরা ভস্মে ঘৃতাহুতি করেন। আর এটাই তো বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

অবশ্য বিবেকানন্দ শিবজ্ঞানে জীবসেবার এই আদর্শ লাভ করেছিলেন তাঁর তত্ত্ব গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। গুরুর কাছ থেকে উপলব্ধ এই তত্ত্বটি বিবেকানন্দ তাঁর মনন সাধনায় অপূর্বভাবে, অনবদ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবা কেবল একটি কথার কথাই নয়, এটি একদিকে যেমন সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শনের একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ, তেমনি এটি অদ্বৈত জ্ঞান লাভেরও একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। একে কর্মবহুল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে বহুমুখী ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে। শিবজ্ঞানে জীবসেবার এই যে আদর্শ, তার মধ্যেই বেদান্তের মূল শিক্ষা নিহিত। আচার্য শঙ্করও জীবসেবার কথা বলেছেন। তিনি মানুষের দেহকে দেবালয় এবং দেহস্থিত আত্মাকে সদাশিব দেবতা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত সাধু ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি, যিনি বসন্ত ঋতুর ন্যায় মানবগণের উপকার সাধন করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ লিখেছেন, যে মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্য দেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়াইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে মুহূর্তে আমার ভিতরে এইভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—অন্যসব কিছুই অন্তর্হিত হইবে, আমি মুক্ত হইব (বিবেকানন্দ, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৬৯: ১৩৯)। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, প্রত্যেক নর-নারীকে সকলেরই ঈশ্বর দৃষ্টিতে দেখিতে থাকো। তোমরা কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদের যদি সৌভাগ্য হয় তবে, স্বয়ং প্রভুর সেবা কর। ...তোমরা ধন্য যে, সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উপাসনা বোধে ঐটুকু কর। ...তোমার আমার জীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২৩৫)।

এ আলাচেনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বিবেকানন্দ ব্যবহারিক বেদান্তকে কার্যকর বেদান্ত, কর্মজীবনে বেদান্ত, ব্যবহারিক জীবনে বেদান্ত, ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রযত্নসাধ্যতা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলেও কর্মজীবনে বা মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেদান্তের প্রয়োগ বা বেদান্তের আলোকে জীবনযাপন, এই অর্থেই এর অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ব্যবহারিক বেদান্তকে তিনি বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করলেও বেদান্তের আলোকে জীবন যাপন করা অর্থেই তিনি একে ব্যবহারের অত্যধিক পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যবহারিক বেদান্তের আলোচনা করতে গিয়েই বিবেকানন্দ ব্রহ্মাত্ম তত্ত্বের উপলব্ধি যাদের জীবনের আদর্শ বলে বিবেচিত হবে, তাঁদের জীবনের ধারা

এবং চিন্তার প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তার বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তাঁর মতে, এজন্য শুরুতেই চিন্তা ও ভাবের পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। নতুবা জীবনধারা ও চরিত্রধারার পরিবর্তন আদৌ সম্ভব নয়। তাই বিবেকানন্দ লিখেছেন,

> বেদান্তের ঐ সকলরভাব পূঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। অতএব একটু ধৈর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমাদিগকে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে, বিশেষত জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় (আচরণে ও চিন্তায়) কিভাবে উহাকে কার্যে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ কিরূপে বেদান্তের উচ্চভাব ও সাধনসমূহ চিন্তায়, আচরণে ও কর্মে প্রকাশিত হয়, দেখিতে হইবে। আর ইহাও দেখিতে হইবে, কিভাবে এই আদর্শ নিম্নতর আদর্শ হইতে ক্রমশ বিকশিত হইতেছে, কিভাবে এই একত্বের আদর্শ আমাদের পারিপার্শ্বিক সমুদয় ভার হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশ সর্বজনীন প্রেমে পরিণত হইতেছে (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২২১)।

বিবেকানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাকেও ব্যবহারিক বেদান্ত নামে আখ্যাত করেছেন। গীতা হচ্ছে বেদান্তের স্মৃতি প্রস্থান, বিবেকানন্দ যাকে বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য বলেছেন। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে কর্মবীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে ব্রতী হওয়ার জন্য নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এগুলো বেদান্ত সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ বিশেষভাবে ক্রিয়া সাপেক্ষ, আর যা ক্রিয়া সাপেক্ষ তাই ব্যবহারিক। সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাও ব্যবহারিক বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত। বিবেকানন্দ কর্মজীবনে বেদান্ত শীর্ষক ভাষণেও পুনঃপুনঃ গীতার কথা উল্লেখ করেছেন। বেদান্তকে কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হলে আভ্যাসের দ্বারা তাকে আয়ত্ত করে পূর্ণতা লাভ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ লিখেছেন,

> বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত—যাহাই ঘটুক না কেন, যে স্থিরতা কখনও নষ্ট হইবার নয়—চিত্তের সেই সমতা কখনও নষ্ট হইবার নয়। ... কার্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্বাপেক্ষা ভাল। কাজের ভিতরে যত কম আকর্ষণ বা কামনা থাকে, আমরা ততই সুন্দরভাবে কাজ করিতে সমর্থ হই। ... যে ব্যক্তি ক্রোধ, ঘৃণা বা কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় একটা বেশি কিছু করিতে পারে না, সে নিজেকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, সে বড় একটা কাজের লোক হয় না। কেবল শান্ত, ক্ষমাশীল, স্থির চিত্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করিয়া থাকেন (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২২৩)।

তিনি আরও বলেছেন যে, সমুদয় শক্তি পূর্ব থেকেই আমাদের ভেতরে রয়েছে। আমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে হাত দিয়ে অন্ধকার অন্ধকার বলে চিৎকার করছি। হাত সরিয়ে নিলে দেখা যাবে প্রথম থেকেই আলোক ছিল। এভাবেই বেদান্ত শুধু যে বলেন—আদর্শকে কার্যে পরিণত করা যায়, তা নয়, উপরন্তু বলেন, পূর্ব থেকেই আমাদের উপলব্ধ। আর যাকে আমরা এখন আদর্শ বলছি, তাই বাস্তব সত্তা—তাই আমাদের স্বরূপ। আর যা কিছু দেখছি সবই মিথ্যা (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২২৪)। এখানে বিবেকানন্দ আদর্শ বলতে মুক্তি বা ব্রহ্মাত্মাকে বুঝিয়েছেন। কর্মীবনে বেদান্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ নিরতিশয়ভাবে ভাবনা-চিন্তা করতেন। বেদান্তকে কিভাবে লোকায়ত ধর্মে পরিণত করা যায়, এই ছিলো তাঁর সব প্রশ্নের বড় প্রশ্ন। দৈনন্দিন জীবনে এর সার্বিক ও যথাযথ প্রয়াগে সম্বন্ধে তিনি আরও লিখেছেন

যে, একমাত্র আত্মবিশ্বাস স্বরূপ আদর্শই মানব জাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিত ভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হতো, তাহলে মানব জাতির কোন দুঃখ থাকতো না। কেননা এই আত্মবিশ্বাস কেবল ক্ষুদ্র 'আমি' কে নিয়ে নয়, জগতের সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বেদান্ত বহুর মধ্যে এই একত্বেরই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বিবেকানন্দের মতে আত্মপ্রীতির অর্থ সর্বভূতে প্রীতি। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এক একটি অনন্ত শক্তি ও আনন্দের সমুদ্র বিরাজমান। বিবেকানন্দের মতে, আত্ম বা অরে শ্রোতব্যঃ, এই আত্মার কথা প্রথমে শুনতে হবে। দিন-রাত্রি শ্রবণ কর, তুমিই সেই আত্মা। দিন রাত্রি পুনঃপুনঃ বলতে থাকো, যে পর্যন্ত না ওই ভাবে তোমার প্রতিটি রক্তকণাতে, প্রতিটি শিরায় ও ধমনীতে স্পন্দিত হয়, যে পর্যন্ত না এ তোমার মজ্জাগত হয়ে যায়। তখন ওই চিন্তা শক্তির প্রভাবে তোমার সমুদয় কর্মই পরিবর্তিত হয়ে উন্নত দেব ভাবাপন্ন হয়ে যাবে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হয়ে থাকে, কিন্তু যারাযথাই এই ভাব কর্মে পরিণত করতে চায়, তাদের পক্ষে এ প্রথম শিক্ষা। নিজেকে অথবা অপরকে দুর্বল ভেবোনা। যদি পার লোকের ভালো কর, জগতের অনিষ্ট করো না (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২২৩)। আবার সিদ্ধ অবস্থা ও সিদ্ধান্তের কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন, সিদ্ধ হলে এমন এক অবস্থা আসবে, যখন এই সমুদয় জগৎ প্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত হবে। এটি ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হবে এবং আমাদের আত্মাকে ও আমরা ব্রহ্ম বলে অনুভব করব। অতএব নানা জগৎ, নানা জীবন বলে কিছু নেই। এই বহু সেই একেরই বিকাশ মাত্র। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করছেন। অতএব আমাদের প্রথম সাধন নিজকে ও অপরকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া। পৃথিবীতে এই মহান আদর্শের ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হোক, কুসংস্কারগুলো দূর হোক। দুর্বল মানুষকে শুনাতে থাকো তুমি শুদ্ধ স্বরূপ; ওঠ, জাগো হে মহান—এই নিদ্রা তোমার সাজেনা। ওঠ, এই মোহ তোমার সাজেনা। তুমি নিজেকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করোনা। হে সর্বশক্তিমান, ওঠ, জাগো; স্বরূপ প্রকাশ কারো (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২৫৭)। সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্য হলো, যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখবে, তখন সকল প্রাণী—এমনকি ব্যাঘ্র পর্যন্ত তোমার নিকট আসলে তাকে স্বাগত জানাবে। যা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসছেন—তিনি আমাদের পিতা-মাতা-বন্ধু। আমাদের আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করছে। ভগবানকে পিতা বলা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব আছে; সাধকেরা তাঁকে 'মাতা' বলে থাকেন। তা অপেক্ষাও উচ্চতর ভাব আছে—তাঁকে 'প্রিয়সখা' বলা। সর্বাপেক্ষা উচ্চভাব—তাঁকে 'আমার প্রেমাস্পদ' বলা। এর কারণ এই প্রেম ও প্রেমাস্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্বোচ্চভাব (বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯: ২২৩)।

বেদান্তকে কর্মবহুল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে একজন যথার্থ বৈদান্তিক কিভাবে সত্যের পরীক্ষা ও বিচার করবেন, এ ব্যাপারেও বিবেকানন্দ লিখেছেন। এখানে তাঁর বক্তব্য হলো, আমাদের জানতে হবে––পবিত্রতা ও একত্বের সত্যের পরীক্ষা। যাতে একত্ব হয়, যাতে মিলন হয়, তাই সত্য। প্রেমই সত্য, কারণ এ মিলনকারী। ঘৃণা অসত্য, কারণ এ বহুত্বের ভার আনে, পৃথক করে। প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্ব সাধক। অতএব দেখতে হবে, আমাদের কর্মগুলো একত্ব সম্পাদক, না বহুত্ব বিধায়ক। যদি বহুত্ব বিধায়ক হয় তবে ওই গুলো ত্যাগ করতে হবে, আর যদি একত্ব সম্পাদক হয়, তবে ওই গুলো সৎকর্ম বলে জানবো। চিন্তা সম্বন্ধেও এরূপ দেখতে হবে এ বহুত্ব বিধায়ক, না একত্ব সাধক। এভাবেই বিবেকানন্দ তাঁর ব্যবহারিক বেদান্তের মূল বিষয় বিধৃত করেন।

এ আলোচনায় ব্যবহারিক বেদান্ত বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, ঠিক কি কি অর্থে তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন, দৈনন্দিন কর্মবহুল জীবনে কিভাবে বেদান্তকে প্রয়োগ করে তা থেকে সুফল পাওয়া যায়, সর্বোপরি কিভাবে গিরিগুহা ও অরণ্য থেকে বেদান্তকে লোক চক্ষুর সামনে এনে মানুষের লোক ধর্মে পরিণত করা যায়, তা তিনি একে একে সুস্পষ্ট করেছেন।

উপসংহারঃ বেদান্ত দর্শনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকের উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, বেদান্ত দর্শন একটি বিশ্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। বেদান্তের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে, সব ধর্মেরই মূলনীতি এক। কেবল মানুষের আত্মার একত্বের মধ্যেই নয়, সূত্রাত্মা রূপে সকল বুদ্ধি ও প্রাণের একত্ব এবং বিরাট রূপে সকল দেহের একত্বের মধ্যেও বৈদান্তিক মানবতাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আর এ কারণেই দৈহিক দিক দিয়ে বা প্রাণ বুদ্ধির দিক থেকে অপর মানুষকে অবনমিত করে বা বঞ্চিত করে অগ্রসর হওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। তাই অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের অবস্থা উন্নত করার জন্য বেদান্ত দর্শন আহ্বান জানায়।

তথ্যনির্দেশ

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৯।
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*, জেনারেল, কলকাতা, ২০০০।
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, কলিকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, ২য় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, ৫ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, *বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা*, কলিকাতা, ১৯৯০।